পুনশ্চ : অদ্বৈত মল্লবর্মণ এবং তিতাস একটি নদীর নাম

শান্তনু কায়সার

১৯৯৪-র ডিসেম্বরে কলকাতার 'বাঙলা দলিত সাহিত্য সংস্থা' থেকে অচিন্ত্য বিশ্বাস ও তাঁর সহযোগিতায় মনোহরমৌলি বিশ্বাস, সুস্মাত জানা ও মণ্ডল হেমব্রমের সম্পাদনায় 'চতুর্থ দুনিয়া'র 'অদ্বৈত মল্লবর্মণ বিশেষ সংখ্যা' প্রকাশিত হয়েছে। অদ্বৈত ও 'তিতাসে'র সম্পূর্ণ পরিচয় তুলে ধরার ক্ষেত্রে এটি খুবই সৎ ও আন্তরিক প্রয়াস। এ সংখ্যায় অদ্বৈতকে যারা প্রত্যক্ষভাবে জানতেন এমন তিনজনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এরা হচ্ছেন অদ্বৈতর কৈশোর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহচর সুবোধ চৌধুরী, দুই দফায় তাঁর সহকর্মী সাগরময় ঘোষ এবং 'আনন্দবাজার পত্রিকা' তথা 'দেশ'-এ অদ্বৈতের পাশের টেবিলের সহকর্মী জ্যোতিশ দাশগুপ্ত। এদের সাক্ষাৎকারের থেকে অদ্বৈতর ঘনিষ্ঠ ও ভেতরের পরিচয় পাওয়া ও তাঁর সৃষ্ট 'তিতাসে'র অন্তঃপ্রেরণা অনুভব করা যায়।

১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মণবেড়িয়া মাইনর স্কুল থেকে বৃত্তি পেয়ে অদ্বৈত যখন অন্নদা হাইস্কুলে ভর্তি হন তখন তার ওপরের শ্রেণিতে পড়তেন সুবোধ চৌধুরি। সে কারণে তিনি তাকে 'মেধাবী অনুজ' বলে উল্লেখ করেন। চৌধুরি বলছেন, 'অদ্বৈতর সঙ্গে আমার পরিচয় সম্পর্ক তখন থেকে। একটানা নয়, কারণ মাঝখানে আমরা জুড়ে গেলাম বৈপ্লবিক রাজনীতিতে, টানা ছ-বছর বিনাবিচারে বহরমপুরসহ বিভিন্ন বন্দিশালায় থাকতে হল— তারপর আমাদের জীবনের বাঁক ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়ল কলকাতা মহানগরীতে। সে চল্লিশের দশক।' অদ্বৈতও পরবর্তীকালে ওই ধরনের বিপ্লবী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হতে গিয়ে অনুশীলন সমিতির সদস্য হয়েছিলেন। কিন্তু ছাত্রজীবনে 'সম্ভব সৎ' মানুষ হিসেবে ও 'বিশাল হৃদয়' নিয়ে তিনি দ্বন্দ্বে পড়েছিলেন। সুবোধ চৌধুরির স্মৃতিচারণ '১৯২৮-২৯ নাগাদ আমাদের স্কুলে ধর্মঘট হয়। সেই প্রথম ছাত্র ধর্মঘট। স্কাউট ট্রেনিং শেষ করার পর পদক প্রদান অনুষ্ঠানে কুমিল্লার এস. পি এসেছেন। আর ছাত্ররা ঠিক করেছে তারা কিছুতেই 'ইউনিয়ন জ্যাক'কে অভিনন্দন জানাবে না। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মঘট। স্কুল প্রায় জনমানবশূন্য। সামান্য উত্তেজনা আছে। ফাঁকা স্কুল ঘরের কোথাও কেউ আছে কিনা দেখতে গিয়ে বড় হলঘরের এককোনায় দেখতে পেলাম অদ্বৈতকেও! কাঁদছেন। কারণ তাঁর ধারণা ধর্মঘটে যোগ দিলে তাঁর স্কলারশিপ চলে যাবে। তাহলে তো পড়তেই পারবেন না। আর ধর্মঘটে যোগ না দেওয়া তো মানতে পারেন না।'

পরিণত জীবনে ঔপন্যাসিক ও কথাসাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেও 'তের-চৌদ্দো বছর বয়স থেকেই অদ্বৈতর কবিখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।' সুবোধ চৌধুরীর কাছেই শোনা যাক;

'ভালো ছাত্র হিসেবে তাঁর নাম ছিল, কবি হিসেবেও অদ্বৈত রীতিমতো খ্যাত পেয়েছিলেন। তখন 'সন্দেশ' বন্ধ। কুমিল্লা অঞ্চলে শিশুকিশোর পত্রিকা যেত কিছু কিছু। পত্রিকাগুলোর মধ্যে 'মাস পয়লা', 'খোকাখুকু' বা 'শিশু সাথী'র কথা মনে পড়ছে। অদ্বৈত তখন এসব পত্রিকায় কবিতা লিখতেন। শ্রীহট্টের হবিগঞ্জ থেকে একটি পত্রিকা, পূর্ববঙ্গে বেশ পরিচিত ছিল, এখনই নাম মনে পড়ছে না, সেখানেও অদ্বৈতের তেমন একটি কবিতায় একাংশ আমার মনে পড়েছে :

পুব গগনের রক্ত অরুণ আমরা তরুণ শক্তিমান
বিশ্ব হিতে রক্তকিরণ করবো মোরা করবো দান।
মোদের চরণ স্পর্শে রে
বিশ্ব হিতে করবো মোরা-তপ্ত বুকের রক্তদান।

'যতদূর স্মরণ হয় এই ছিল কবিতাটির একটি স্তবক। কবিতার প্রথম অংশ ঠিকই আছে, তবে এই দুবার 'দান' শব্দ দিয়ে অন্তমিলের অংশটাতে সন্দেহ হচ্ছে আমার। অদ্বৈত সেই ছাত্র বয়সেও শব্দ চয়নে এত দীন ছিলেন না। বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা তখনও প্রকাশ পায়নি। নজরুল ইসলাম তখন প্রবল জনপ্রিয়! পূর্ববঙ্গের ঐসব অঞ্চলে তখন নজরুলের গানের আবহাওয়া ছিল যথেষ্ট। অদ্বৈত মল্লবর্মণের প্রথম জীবনের কবিতায় নজরুল ইসলামের স্বাদেশিকতা ও উদার মানবিকতার প্রবল প্রভাব পড়েছিল বলে মনে হয়। এছাড়া কামিনী ভট্টাচার্য ও অজয় ভট্টাচার্যের স্বদেশি গান ও কবিতার দ্বারাও অদ্বৈত প্রভাবিত হয়ে থাকবেন।' অতঃপর প্রকৃতি বিষয়ক একটি কবিতার প্রসঙ্গে, যখন 'ফুল ফুটছে, পাখি ডাকছে, ভ্রমর গুনগুন করছে', সুবোধ চৌধুরি বলেছেন, অদ্বৈত লিখেছিলেন, 'লজ্জা নমিত মাথা নোয়াইয়া/শীত বলে আমি যেতেছি।' যে সময়ের কথা তখন জীবনানন্দের কাব্যগ্রন্থ হয়ে আদৌ প্রকাশিত হয়নি অথবা 'ঝরা পালক' প্রকাশিত হয়ে থাকলেও, যাতে কবি ঠিক তখনও জীবনানন্দ হয়ে ওঠেননি, ব্রাহ্মণবেড়িয়ার কিশোর অদ্বৈতর কাছে তা পৌঁছানোর কথা নয়। তবু অদ্বৈতের এ কবিতাংশে যে জীবনানন্দীয় মেজাজ ও কাব্য-স্বাদ পাওয়া যায়, বিশেষত ক্রিয়াপদের সাধু প্রলম্বিত এবং লৌকিক ব্যবহার, তা নিশ্চিতই তাঁর ভাষা ও মর্মজ্ঞানের পরিচায়ক। সুবোধ চৌধুরির স্মৃতিচারণ থেকেও তা বোঝা যায়, 'আমরা উঁচু ক্লাসে, কিন্তু তাঁর পড়াশোনার সীমা ছিল তুলনায় বেশি। সপ্তম শ্রেণিতে পড়তেন যখন, (ব্রাহ্মণবেড়িয়া) আনন্দময়ী কালীবাড়ির সামনের হলঘরের একটি বিতর্ক সভায় অদ্বৈত বলেছিলেন আমাদের দেশে এখন ইন্দ্রনাথের মতো ছেলে দরকার। বলতে দ্বিধা নেই 'শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' আমরা তখনও পড়িনি। তখনকার দিনের দেশানুরাগী মানবতাবাদী যুবকদের আদর্শ হিসেবে ইন্দ্রনাথের কথা সেই প্রথম শুনলাম।' ওই সময় ব্রাহ্মণবেড়িয়াতেই আরেকজনের সাহিত্য-প্রতিভা খ্যাতির মুখ দেখছিল—তিনি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বড়লোক বাড়ির উকিলের ছেলে। তিনি সুবোধ চৌধুরির এক শ্রেণি অর্থাৎ অদ্বৈতর দুই শ্রেণি ওপরে অর্থাৎ অদ্বৈত যখন সপ্তম শ্রেণিতে তখন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী নবম শ্রেণিতে পড়তেন।

আর জীবনের শেষ পর্বে তাঁর রোগাক্রান্ত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়, সাগরময়

ঘোষের কাছ থেকে 'ভিতরে ভিতরে অদ্বৈত বাবু বোধহয় ক্ষয়িত হচ্ছিলেন আগে থেকেই। তিনি বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন কিছুটা। সে সময় খুবই সঙ্কুচিত থাকতেন। দূরে দূরে সরে যেতেন। নিজের জলের গ্লাসটি রাখতেন সরিয়ে! মুখে রুমাল চাপা দিয়ে কাশি চাপার চেষ্টা করতেন। 'দেশে' তখন ডা. সতীশ গঙ্গোপাধ্যায় আসতেন আড্ডা দিতে। তাকে আমরা অনুরোধ করি অদ্বৈতর শরীর পরীক্ষা করতে। রোগনির্ণয় করে উনি যথাসত্বর হাসপাতালে ভর্তি করার পরামর্শ দেন। কাঁচড়াপাড়া যক্ষ্মা হাসপাতালে ভর্তি করা হল। 'দেশ' কর্তৃপক্ষ, বিশেষ করে কানাইলাল সরকার মশাইয়ের চেষ্টায় তাঁর চিকিৎসার বন্দোবস্ত হল। ধীরে ধীরে সেরেও আসছিলেন। তবে একসময় কাউকে কিছু না জানিয়ে হাসপাতাল থেকে পালিয়ে আসেন।' কেন অদ্বৈত তা করলেন সেটা জানা যায়, হাসপাতালে ওই সময় চিকিৎসাধীন আরেকজন রুগি অমর মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। তিনি লিখেছেন, 'তখন দেশের অবস্থা খুবই জটিল। পূর্ব বাংলা থেকে প্রতিদিন দলে দলে মানুষ চলে আসছে পশ্চিমবাংলায়। তাদের অবর্ণনীয় দুর্দশার কথা খবরের কাগজ ভরিয়ে দিচ্ছে। বর্মনদা কাগজ পড়েন। মাঝে মাঝে উত্তেজনা প্রকাশ পায় কপালে করাঘাত করেন—তাঁর বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন যারা পূর্ব বাংলা থেকে এসে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাদের খবর নেবার জন্য প্রতিদিনই গোছা গোছা চিঠি লেখেন। মাঝে মাঝে দু-একখানা চিঠির উত্তরও আসে। বর্মনদা চঞ্চল হয়ে পড়ে। চোখ দুটো জলে ভরে যায়। রাত্রের ঘুমটাও চলে যায়। প্রায় বলেন, 'এই হাসপাতালের অলস জীবন আর ভালো লাগে না। মনে হয় পালিয়ে যাই।' আমি বলি—'তার চেয়ে বরং আপনি শিগগিরি সুস্থ হয়ে উঠুন এবং দীর্ঘদিন ধরে ওদের সেবা করুন।'

বর্মনদার মুখে ম্লান হাসি ফুটে। বলেন—'জানেন তো এবারের বুকের ছবিটা আরো খারাপ হয়ে গেছে। কাজেই নিরাময়ের আশা খুবই কম। এখন শুধু এই শয্যায় পড়ে থেকে মৃত্যুর প্রতীক্ষা। তাই ভাবছি, যে কটা দিন পারি ওদের পাশে থেকে কাটাই।' কিন্তু বেলেঘাটার ষষ্ঠীতলায় তিনতলার চিলেকোঠার বাসায় ফিরেও তিনি বেশিদিন বেঁচে থাকতে পারেননি। 'শেষেরদিকে একটি ছেলে তাঁকে রান্না-বান্না করে দিত। এসময় অদ্বৈতবাবু ঘন ঘন জ্বরে ভুগতেন।' একদিন ওই ছেলে এসে খবর দিল, 'গতকাল রাত্রে অদ্বৈত মল্লবর্মণ মারা গেছেন। একা একা বাসাবাড়ির চিলেকোঠায়।' এ প্রসঙ্গে ২০/৪, অশ্বিনী দত্ত রোড, কলকাতা-২৯ থেকে ৩০-৮-১৯৫১ সুফি জুলফিকার হায়দারকে বসুধা চক্রবর্তী লিখেছেন, 'আপনি অদ্বৈত মল্লবর্মণের ঠিকানা জানতে চেয়েছেন এবং তাকে আপনার প্রীতিজ্ঞাপক করতে বলেছেন। গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, দীর্ঘকাল যক্ষ্মা রোগে ভুগবার পর গত ২রা বৈশাখ তারিখে তার শোচনীয় জীবনান্ত ঘটেছে। শেষ নিশ্বাসের অল্প পূর্বে নিজ বাসায় ফিরে এসেছিলেন। চিঠির অন্তিমাংশে তার মন্তব্য ধনতান্ত্রিক সমাজ তাঁকে তিলে তিলে একান্ত অকালে অসময়ে জীবনের বিরাট প্রতিশ্রুতি অসম্পূর্ণ রেখে হত্যা করেছে।' (কবি জুলফিকার হায়দার জীবন ও সাহিত্য/দেওয়ান আবদুল হামিদ)।

তাঁর সাক্ষাৎকারে সাগরময় ঘোষ অদ্বৈত সম্পর্কে বলেছেন, 'অত্যন্ত চাপা স্বভবের মানুষ ছিলেন।' জ্যোতিষ দাশগুপ্ত জানিয়েছেন, 'সহকর্মী হিসেবে যেটুকু দেখেছি তাতে মনে হয়েছে, মানুষটা খুব অন্তর্মুখী স্বভাবের। আলাপচারিতায় অনভ্যস্ত ছিলেন। চুপচাপ থাকতেন। কাজকর্ম করতেন একমনে—নিবিষ্ট চিত্তে। কাজের কথা ছাড়া অন্য কথা প্রায় বলতেন না।' কিন্তু এই বিষয়টির সঙ্গে বোধহয় আরেকটি বিষয় মিলিয়ে নেয়াও ভেবে দেখা দরকার। সাগরময় ঘোষের বর্ণনা 'অত্যন্ত পরিশ্রমী ছিলেন। তবে খুব রোগা শরীরে কেমন একটা অসুস্থতার ভাবও ছিল।' জ্যোতিশ দাশগুপ্ত বলেছেন, 'অদ্বৈতর স্বাস্থ্য ভাল ছিল না তেমন। দেখে মনে হত সারা শরীরে অপুষ্টির ছাপ আছে।' এঁদের দুজনের বিবরণ থেকে জানা যায়, 'বিধবা দিদির পরিবার', ছোট ছোট দুই ভাগ্নেসহ, 'সম্পূর্ণভাবে তাঁর ওপর নির্ভরশীল ছিল।' তাঁর মৃত্যুর পর একজন ভাগ্নে সাগরবাবুর কাছে আসতেন। ভদ্রলোককে সাগরবাবু কিছু অর্থ সাহায্য করতেন বোধহয়। মানুষটিকে দেখলেই বোঝা যেত অদ্বৈত মল্লবর্মণের পরিবার পরিজনরা ছিলেন অভাবী, দুস্থ প্রকৃতির। অতএব 'পুঁথিঘরে' অদ্বৈত যখন প্রথম 'তিতাসে'র পাণ্ডুলিপি জমা দেন তখন যে সুবোধ চৌধুরি বলেছিলেন, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন 'পদ্মা নদীর মাঝি', আর কি তোমার বই মানুষে নেবে?' তখন তার উত্তরে অদ্বৈত যা বলেছিলেন তাতে একেবারে তৃণমূলের মানুষের, তার অংশীদারিত্বের কণ্ঠই ধ্বনিত হয়েছিল, 'সুবোধদা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বড় artist, master artist কিন্তু, বাত্তনের পোলা—রোমান্টিক। আর আমি তো জাউলার পোলা।'

(মালো সন্তান হিসেবে অদ্বৈত জীবনকে যত ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছিলেন তার পেছনে বর্ণ ও শ্রেণিশাসিত সমাজের কঠোর বন্ধন বহুকাল থেকে সক্রিয় রয়েছে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের সংকলিয়তা যেমন দেখিয়েছেন ক্ষত্রিয় পিতা ও বৈশ্যমাতার সঙ্গম থেকে মালোদের পূর্বজ কৈবর্তদের উদ্ভব কিংবা মহাভারতের মৎস্যগন্ধার কাহিনি থেকে যেমন জানা যায় রাজা শান্তনু বা মুনি পরাশরের মতো উচ্চবর্গের ব্যক্তিদের যৌন-সংশ্লিষ্টতা সত্ত্বেও তার স্বীকৃতির অভাবে মৎস্যগন্ধার সময় থেকেই মৎস্যজীবী কন্যারাও সমাজে উপেক্ষিতা তা ওই মৌল দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই জাত।) পূর্ব বাংলার আদি আদিবাসীদের মধ্যে কৈবর্তরা অন্যতম। এদের মধ্যে থেকে কালক্রমে হালিয়া দাস তথা চাষিদের এবং জালিয়া দাস তথা মৎস্যজীবীদের দুটি আলাদা ভাগের সৃষ্টি হয়। হালিয়া দাসের নিজেদের উন্নততর ভেবে মাহিষ্য দাস বলে পরিচয় দেয়।

তিতাস শুকিয়ে গেলে চরের জমি দখল নিয়ে উপন্যাসে চাষি ও জেলেদের মধ্যে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হতে দেখা যায় তাতেও ওই পুরনো বিবাদের বীজ থাকা অসম্ভব নয়। অধিকতর নিম্নবর্ণ থেকেও যে মালোদের বিকাশ হয়েছে কিংবা অন্ত্যজ ভুঁইমালিদের প্রসঙ্গ যেভাবে উপন্যাসে এসেছে তা থেকে তৃণমূলে শোষিত হওয়ার বিষয়টি অদ্বৈত মল্লবর্মণের চেতনার কতটা গভীরে যে শিকড় গেছিল তা বোঝা যায়। কলিপকৃষ্ণ ঠাকুরের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় এটি শুধু উপন্যাসিক ও সম্প্রদায় গোত্রেরই ব্যাপার ছিল না। ছিল তা

অনেক গভীর ও ব্যাপক পটভূমির। ১৯০৫ সালের পরবর্তী সময়ে কংগ্রেস সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও পরে অম্বিকাচরণ মজুমদার মতুয়া নেতা গুরুচাঁদ ঠাকুরকে অনুরোধ করেন তার অনুগামীদের নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে। উত্তরে গুরুচাঁদ লিখেছিলেন—'ইংরেজ বিতাড়ন জরুরি সন্দেহ নেই, কিন্তু আরো বেশি জরুরি আমাদের অন্ত্যজ মানুষের সমানাধিকার। উচ্চ-নিচ ধারণার অবসান।' অদ্বৈতে বিষয়টি কতটা দৃঢ়—প্রোথিত ছিল তা বোঝা যাবে যদি আমরা 'তিতাসের' বর্জিত দুটি অংশ স্মরণ করি। 'ব্রাহ্মণের পাশে নমঃশূদ্রের মত এই নৌকাগুলোর পাশে তার ছোট নৌকাখানি নড়াচড়া করিতেছে।' 'এখানে আয়েসে সুখ আহারের প্রাচুর্য পাইয়া মাছগুলো ছোট মাছগুলোকে খাইবার তাগিদ ভুলিয়া যায়।' ওই দুটি অংশ মূল পাণ্ডুলিপিতে বর্জিত হলেও এর পেছনে যেহেতু তাকে শিল্পঋদ্ধ করে তোলাই ছিল লেখকের উদ্দেশ্য সেহেতু তার ভাবনাই, বরং তাতে অধিকতর গুরুত্ব অর্জন করেছে। বর্ণিত অংশে বড় মাছেরা ভুলে গেলেও কিংবা চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপিতে তা বর্জিত হলেও শেক্সপীয়রের Pericles, Prince of Tyre-এর প্রথম জেলের মন্তব্যের মতো অদ্বৈতও জানেন এবং এ সত্য স্বীকার করেন যে 'as men do a land the great ones eat up the little ones. I can/Compare our rich misers as nothing so fifty/As to a whale.' আর জানতেন এবং মানতেন বলেই তার বিশ্ব সাহিত্য পাঠ নেহাতই সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ছিল না, বরং তার মধ্য দিয়ে অন্ত্যজ শেকড় ও প্রেরণা থেকে তিনি পৌঁছেছিলেন পণ্য সংস্কৃতির সেই অসারত্ব আবিষ্কারে যা শেক্সপিয়রেরই King John-এর Robert Faulconbridge-এর উক্তিতে ভাষা পেয়েছে :

Since Kings break faith upon commodity
Gain, be my lord, for I will worship thee.

দুই

সুবোধ চৌধুরি তাঁর সাক্ষাৎকার জানিয়েছেন, 'বুদ্ধদেব বসুর' এক পয়সার একটি গল্প' সিরিজে তাঁর একটি গল্প ছেপেছিলেন। গল্পটি তখন বেশ খ্যাতি পায়। আরও কিছু গল্প তিনি লিখে থাকবেন।' এ সম্পর্কে সুমিতা চক্রবর্তী 'ছোট গল্পের অদ্বৈত মল্লবর্মণ' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, তাঁর 'স্পর্শদোষ' গল্পটি '১৯৪১-৪২'-এর মধ্যে এবং 'সন্তানিকা' অন্তত এর চার বছর আগে লেখা হয়েছিল। দ্বিতীয় গল্প, 'স্পর্শদোষ' প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, '১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত অদ্বৈত মল্লবর্মণের নিয়মিত কোনও চাকরি ছিল না। 'নবশক্তি' বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অনিয়মিতভাবে দু-একটি পত্র-পত্রিকায় কিছু কিছু কাজ করেছেন। সেই সময় লিখেছেন গল্পও। তার একটি হল 'স্পর্শদোষ'। গল্পটিতে ১৯৪০-৪২-এর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও হিটলারের তাণ্ডবের উল্লেখ আছে। মন্বন্তরের কোনও উল্লেখ নেই বলে মনে হয় ১৯৪৩-এর অগেই লেখা। এই গল্পের বিষয় 'ক্ষুধা' এবং দ্বিতীয় গল্পের 'ক্ষুধা ও দারিদ্র্য।' 'সন্তানিকা'র বৃদ্ধ, ধনঞ্জয় ঘোষাল এক তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রের পেছন পেছন এসে

ওই বাড়িতে আশ্রয় পায়। (গল্পটিতে কি অদ্বৈতের আত্মজৈবনিক দূর-প্রভাব রয়েছে? তাঁর বিদ্যালয়-জীবনে তিনি হয়তো এ ধরনের ঘটনার সাক্ষী হয়ে থাকবেন, আর ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্র থাকার সময় কুমিল্লার এক কায়স্থ পরিবারে তিনি লজিং থাকতেন বলে জানা যায়।) কিন্তু অক্ষমতা ও আলস্যের কারণে ছাত্র পড়ানোর দায়িত্ব ঠিকভাবে পালিত না হওয়ায় তাকে ওই বাড়ি ত্যাগ করতে হয়। কিন্তু তারপরে পথ থেকেই ফিরে এসে সে গিন্নিমার মাতৃস্নেহের আশ্রয় লাভ করে। গল্পটিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সুমিতা চক্রবর্তী লিখেছেন, 'লক্ষ করি, এই গল্পে কোনও জাতিগত বা গোষ্ঠিগত অস্বস্তির সৃষ্টি হতে পারে—এমন পরিস্থিতিও বর্জিত হয়েছে। ধনঞ্জয় ব্রাহ্মণ, বীরেশবাবুও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। খাওয়াছোঁওয়া সংক্রান্ত সবরকম সংঘাতই সেজন্য এ গল্পে অনুপস্থিত থেকে গেছে। ধনঞ্জয় ঘোষালের জন্য, হয়তো ব্রাহ্মণ বলেই শিক্ষকতা ভিন্ন অন্য কোনও কাজ নির্ধারিত হয়নি। লোকাচার মেনে চলা মধ্যবিত্ত মানসিকতাকে খানিকটা প্রশ্রয়ই যেন দিয়েছেন এই গল্পে অদ্বৈত মল্লবর্মণ।' প্রায় এইরকম একটি মূল্যায়ন উপস্থিত করেছেন গৌতম ভদ্র ঋত্বিকের চলচ্চিত্র 'তিতাসে'র সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনার সূত্রে : 'তিনি (ঋত্বিক) বলেছেন যে অদ্বৈত যেখানে অবক্ষয়ের কথায় উপন্যাস শেষ করেছেন তিনি সেখানে নতুন জীবনের কথায় ছবি শেষ করেছেন। সেখানেই তিনি ছবিটিকে রাজনৈতিক পর্যায়ে উন্নীত করেছেন। ছবিটার শেষে বাসন্তীর মৃত্যু দৃশ্যে গোটা দৃশ্যটি অদ্বৈতর উপন্যাসের শেষ পাতা থেকে নেওয়া হয়েছে। যেমন 'সুবলের বউয়ের নিকট এ সমস্তই স্বপ্ন বলিয়া মনে হইল। এমনকি যে অনন্তবালা সামনে দাঁড়াইয়া আছে, সেও যেন স্বপ্ন মাত্র। একমাত্র সত্য চরের ধানগাছগুলি। কি অজস্র ধান ফলিয়াছে—সেইদিকে চাহিয়া সুবলের বউ ধীরে ধীরে চোখ মুছিল। ...সে অনন্ত। পাছে চিনিয়া ফেলে এই ভয়ে সে মুখ ফিরাইয়া নিঃশব্দে চলিয়া আসিল। কিন্তু সেকি স্বপ্ন। ঝপাত করিয়া একটা শব্দ হইল। সুবলের বউ সে শব্দে চমকিত হইয়া দেখে জলভরা লোটা তার শিথিল হাত হইতে মাটিতে পড়িয়া গিয়াছে।' ...ফলে যে অর্থে অবক্ষয়ধর্মী অদ্বৈতর চেয়ে জীবনধর্মী সঠিক পার্থক্য দাবি করেছেন সেই দাবি ততটা গ্রহণযোগ্য নয়। অদ্বৈত নিঃসন্দেহে অবক্ষয়ধর্মী। কারণ অদ্বৈতর মালোরা বড়ই সংগ্রাম বিমুখ, ভাগ্যের কাছে মূলত বিনা যুদ্ধেই পরাজয় বরণ করে। অদ্বৈতর মানসিকতায় এক বৈষ্ণবধর্ম সঞ্জাত প্রসন্নতা ছিল। যে প্রসন্নতার মানসিকতায় সকল দ্বন্দ্বকে স্বাভাবিক বলে মনে হয়, সকল জ্বালা ও ঘৃণা স্তিমিত হয়ে পড়ে, লেখা ক্রোধের পরিবর্তে এক বিষাদ স্নিগ্ধতা সৃষ্টি করে মাত্র।'

কিন্তু গৌতমের এ মূল্যায়ন যে যথার্থ নয় তার প্রমাণ তিনি নিজই তাঁর প্রবন্ধে দিয়েছেন। উপন্যাসের 'আর্কেটাইপের' চলচ্চিত্রে ব্যবহারে যে বিচ্যুতি ঘটেছে সে প্রসঙ্গে তিনি যা বলেছেন তাতেই ব্যাপারটা বোঝা যায়। 'যারা সমাজের অন্যরকম উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত প্রাকৃতিক শক্তির সাথের অন্য ধরনের সম্পর্কে আসে—তাদের সমাজের 'আর্কেটাইপ' আলাদা হতে বাধ্য। সুন্দরবনে যারা কাঠ কাটতে যায় বা মধু সংগ্রহ করে—তাদের সংস্কৃতিতে বনবিবি বা দক্ষিণ রায়ের মূর্তিই 'আর্কেটাইপ' হিসেবে কাজ করে। ...

মূল উপন্যাসে দেখানো হয়েছে যে, মালোরা সবাই বৈষ্ণব এবং তিতাসের বর্ণনায় তারা যে আর্কেটাইপ ব্যবহার করে তা হল মোহিনী রাধার। আমরা মধ্যযুগের সংস্কৃতির ইতিহাস থেকে জানি বৈষ্ণবধর্ম প্রধানত অন্ত্যজ জেলে, কৈবর্ত, তাঁতি ইত্যাদির মধ্যে ব্যাপক প্রসার লাভ করে এবং শক্তিধর্ম মূলত ধনিক সম্প্রদায়, উচ্চবিত্ত কৃষক সম্প্রদায়ের ধর্ম। মূল উপন্যাসে যেখানে বাবুর সংস্কৃতি ও মালোদের সংস্কৃতির সংঘাত দেখানো হয়েছে সেখানেও বলা হয়েছে যে শক্তি ইত্যাদি সংস্কৃতির সাথে নিছক বৈষ্ণবীয় সংস্কৃতির সংঘাত। এখানে মালোদের মনে এবং সংস্কৃতির জগদ্ধাত্রীর ব্যবহার তাদের জীবনের রূপায়ণ নয়, ঋত্বিকের নিজের আকড়ে ধরে থাকা প্রতিমূর্তির ব্যবহার। এটা মধ্যবিত্তের মননে আরোপিত মালো সংস্কৃতির অবাস্তব রূপ।'

এবং অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার বিচিত্র রূপের বর্ণনার গোষ্ঠী কোনওমতেই ধনতান্ত্রিক সমাজে পুরনোভাবে টিকে থাকতে পারে না—এরকম একটি সার্বজনীন সত্যের দিকে ইঙ্গিত করতে সক্ষম হন। ঋত্বিকের ছবি প্রাকৃতিক শক্তির প্রতি গুরুত্ব আরোপের ফলে পরিবর্তন বিষয়ে এক খণ্ডিত ও বিশেষ সত্যে আবদ্ধ থাকল।'

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বাসন্তীর মধ্যে দিয়ে এর বক্তব্য ও ব্যঞ্জনা স্পষ্ট হয়। গৌতমও লিখেছেন, 'বাসন্তীর মৃত্যুর মধ্যেই মালো সমাজের পরিসমাপ্তি হয়। আবার সেই স্বপ্ন দেখে নতুন সমাজের।' এদিক থেকে চলচ্চিত্রে 'বাসন্তীর উপস্থাপন'কে 'শিল্পসম্মত ও যুক্তিসঙ্গত' হিসেবে উল্লেখ করেও 'প্রতীকগত ব্যবহারে মালো সমাজের বাসন্তীর বিশেষ স্থানটি প্রকাশ পায়নি' বলে তিনি মনে করেন। এর ব্যাখ্যা করে গৌতম লিখেছেন, 'মহাজনের অত্যাচারে ও চক্রান্তে বাসন্তীর স্বামী মারা গেছে। সেই অব্যক্ত ক্রোধ তার মধ্যে ধিকিধিকি চলেছে। তারই ফলে 'সুবলের বউয়ের মধ্যে বিপ্লবী নারী বাস করে, সে দমিতে জানে না।' অর্থাৎ এখানে বাসন্তীর ওপর অত্যাচারের শুরু একটা শোষক ও শোষিতের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে, সুবলের মৃত্যু যার ফল। সেই জ্বালাই বাসন্তীকে বাবুদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে চির প্রতিবাদমুখর করেছে। অন্যদিকে তার বঞ্চিত জীবনে মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা তাকে করেছে অধীর। যার জন্য সে অন্য মেয়েদের কাছে অপমানিত হয়, নিজের মায়ের সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়। ঋত্বিকের কাছে তার নারীত্বের অবমাননা বিভিন্ন স্তরে অনেক বড় হয়ে দেখা দিয়েছে, আবার দ্বন্দ্বটি সেখানে অনেক সহ্যকারী উমা বা চরম বিপর্যয়ে আত্মহত্যায় রত সীতার চাইতে বাসন্তীকে নিশ্চয় অনেক বেশি প্রতিবাদমুখর দেখি। কিন্তু সেই প্রতিবাদের পেছনে আমরা তার ব্যক্তিগত ক্ষোভ বা বঞ্চনার আধিপত্যই দেখতে পাই। এর সাথে মালো সমাজের ইতিহাসে যে গৌতমের সিদ্ধান্ত, 'মার্কসবাদী না হওয়া সত্ত্বেও শ্রেণিগত দিক দিয়ে মালো সমাজের জীবনের সাথে নিবিড় ব্যক্তিগত পরিচয় থাকার ফলে গোটা যূথবদ্ধ জীবন, তার সমস্ত দিক ও ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বগুলো অদ্বৈত অত্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিধৃত করেছেন।'

'স্পর্শদোষ' গল্পেও সীমাবদ্ধ পটভূমিতে লেখক ওই দ্বন্দ্বকে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষার অনুবাদ

করেছেন। যে বাস্তবতায় 'পয়ত্রিশ বছরের ভজা খাবার দেখিলেই পাঁচ বছরের বালকটি হইয়া যায়' কিবা ভজার হাঁটুর সঙ্গে কুকুরের থুতনি লেগে যায় এবং যে বাস্তবতায় হিটলার ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উপস্থিত সে বাস্তবতা প্রকৃতিই দ্বান্দ্বিক। ওই রূঢ়তায় কুকুরের খাবার কেড়ে নেয় মানুষ অথবা তার জন্যে তাকে চালাকি কিংবা ভঙ্গির আশ্রয় নিতে হয়। মানুষের 'পর' হয়ে যাওয়ার পর ভজা একসময় ইতর জীবের সাথে বন্ধুত্ব করতে আপত্তি করেনি, কিন্তু অতঃপর অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে তাকেও সে সরিয়ে দেয় ও ভয় দেখায়। ওই বন্ধুত্ব আবার প্রতিষ্ঠিত হয়। যখন গল্পের অন্তিমে বিস্মিত জনতাকে স্তম্ভিত করে দিয়ে মৃত কুকুর খেঁকিকে জড়িয়ে ধরে সে নীরবে চলে যায়। কিন্তু গল্পে বর্ণনাকারী হিসেবে লেখক অথবা অদ্বৈত যখন বলেন, 'মনের দিক দিয়া শুখাইতে শুখাইতে যাহার দেহ কাঠ হইয়া যায়—অনাহারের দোষই তাহার দিকে আরোপিত হয়। কিন্তু না খাইয়া মরা অপেক্ষা সেতো আরো সাংঘাতিক' তখন দ্বন্দ্বের ভেতর-চিত্র ও চারিত্রকেও শনাক্ত না করে পারা যায় না। এর গুরুত্ব অধিকতর স্পষ্ট হবে যদি আমরা স্মরণ করি যে তিতাসে বাস্তব দ্বন্দ্বের সঙ্গে এর সাংস্কৃতিক বিরোধও উপযুক্ত মাত্রায় উত্থাপিত ও রূপায়িত হয়েছে।

তিন

কিন্তু তা সত্ত্বেও গৌতম ভদ্র যখন বৈষ্ণবীয় প্রসন্নতার কারণে 'অদ্বৈত বা 'তিতাসে' দ্বন্দ্বের অনুপস্থিতির প্রসঙ্গ তুলে বলেন, 'নাট্যকার পরিচালক উৎপল দত্ত নাটকে এই দিকটাকেই বদলে দিয়েছেন' তখন আমরা বিভ্রান্ত হই। দ্বন্দ্বের অনুপস্থিতি বা বৈষ্ণবীয় প্রসন্নতার বিষয়টি যে অদ্বৈত বা তাঁর উপন্যাস সম্পর্কে সত্য নয় সে তো আমরা দেখেছি। অতএব তাকে 'বদলে দেয়া'রও প্রশ্ন ওঠে না। নাটক বা নাট্যরূপটি যেহেতু এখন আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বা কোথাও প্রকাশিত হয়নি সেহেতু যারা সমকালীন, সংশ্লিষ্ট কিংবা ওই প্রযোজনার দর্শক ছিলেন তাদের সাক্ষ্যের ওপরই নির্ভর করা যাক। প্রথমেই শোভা সেন : '১৯৬৩ সালের ১০ মার্চ দোল পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যা ছটার মিনার্ভা মঞ্চে নতুন নাটকের উদ্বোধন হল—'তিতাস একটি নদীর নাম।' মঞ্চ ভাবনার অভিনবত্ব ছিল এই প্রয়োজনার প্রথম আকর্ষণ। দশকের আসনের মধ্যিখান দিয়েই একটি পথ স্টেজে উঠে গেছে। প্রথম দৃশ্যেই মেয়েরা ডালি সাজিয়ে প্রদীপ নিয়ে লাইন করে ঢোকে এ পথ বেয়ে। স্টেজে উঠে একটি নাচের মধ্য দিয়ে তারা একটি ব্রত উদ্‌যাপন করে। আমাদের প্রত্যেককেই নাচতে হত। দশ বারেটি মেয়ে এই নাটকে অংশ নিত।' 'নবান্ন'র পর গ্রামজীবন নিয়ে এত সূক্ষ্ম নাটক, দৃশ্যসজ্জা, অভিনয়, এত সুন্দর প্রযোজনা আর হয়নি। 'তিতাস' যখন নাট্যরূপ পেল ও মঞ্চস্থ করবার জন্য তৈরি তখন বৃদ্ধ রামকেশবের পার্ট কে করবে, এই দাঁড়ায় সমস্যা। আমাদের দলে তো কেউ নেই। মনে পড়ল একজনেরই কথা—সে বিজনদা।' (বিজন ভট্টাচার্য)। 'আমি ও উৎপল গেলাম প্রস্তাব নিয়ে। প্রস্তাব কেন, বলা যায় দাবি। অনেক সাধাসাধির পর প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। এতদিন ছিলেন পরিচালক, এবার এলেন অভিনেতা হয়ে।' 'রাতের পর রাত জেগে চলে মহলা। পরিচালকের ক্লান্তি নেই। আমাদেরও

নেই একটু অবকাশ। বিজনবাবু আমাদের সঙ্গে পেরে উঠবেন কেন? ...

শেষদিন পর্যন্ত ডায়লগ মুখস্থ হতে চায় না ওঁর। আমাদেরই ভাবনা। তার মাঝে নীলিমা গিয়ে তার নিজের ডায়লগ শিখছে বিজনদার কাছে। মালোদের উচ্চারণ আর খাঁটি বিশুদ্ধ কলকাতার ভাষা—আসমান-জমিন ফারাক। নীলিমা এ ব্যাপারে অনভিজ্ঞা। আছেন বিজনদা, অগতির গতি।' 'প্রথম থেকেই 'তিতাস' জনপ্রিয়।' '২১ আগস্ট 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর শততম রজনীর শো হল।' 'একশো' রজনী নাটকটি হই হই করে চলল। সবাই ছুটে আসছে মিনার্ভায়, জায়গা দিতে পারি না। কিন্তু একশো রজনীর বেশি আয়ু টিকলো না। অর্থাৎ বাঙালরা দেখা শেষ করল। আর নাটকের আয়ুও শেষ করল। ততদিনে রটে গেছে, এ নাটকের সংলাপ দুর্বোধ্য।' (স্মরণে বিস্মরণে : নবান্ন থেকে লালদুর্গ।)

সুবোধ চৌধুরি, যাঁকে বক্তা হিসেবে প্রথম মঞ্চায়নের সময় আমন্ত্রণ জানানো হয়, তাঁর সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, উপন্যাসে যেখানে ক্রুদ্ধ জনতার হাতে কিশোরের মারা যাবার বর্ণনা রয়েছে সেখানে 'উৎপল বাবু নাটকের মহলা চলাকালীন একটি বিচিত্র বিষয় ভেবেছিলেন। রামকেশব তার পাগল পুত্র কিশোরকে নিজে হত্যা করছে—।' 'আমি প্রতিবাদ করি, এরকম নাটকীয় ঘটনা সংস্থান তিতাসের যোগ্য নয়। উৎপলবাবু অবশ্য রামকেশবের মুখে ওই পরিণতির কথা ভেবে কিছু সংলাপ ভরে দিচ্ছিলেন। রামকেশবের অভিনয় করছিলেন বিজন ভট্টাচার্য। আমাকে বলেন, 'আপনিই ঠিক, আমরা ডিরেক্টরের অধীন...।' হয়তো উৎপলবাবুর তখনকার অভিনয়ে ওথেলোর প্রভাব পড়েছিল এই দৃশ্য ভাবনায়। পরে, আমাদের প্রতিবাদের পর, অনেক ভেবেচিন্তে উৎপলবাবু মত বদলান।' (প্রসঙ্গত মন্তব্য, 'তিতাস' চলচ্চিত্রায়নের সময়ও এরকম ব্যাপার ঘটেছিল। সুবোধ চৌধুরিরই স্মৃতিচারণ : 'যাত্রায় একটি গোলমাল করে ফেলেন ওরা। কালোচরণ বাসন্তীকে ধর্ষণ করেছেন এরকম একটা দৃশ্য উপস্থাপন করেন। এটা হয় না। বাসন্তীর মধ্য দিয়ে জীবনের অপরাভবকে দেখাতে চান অদ্বৈত। তাকে ধর্ষণ করলে শিল্পগুণের হানি। আমার কথা মনে নেন তারা। এই যাত্রায় সুর করেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস। চিঠি লিখে আমাকে জানিয়েছিলেন অভিনন্দন। আমি তিতাসকে ধর্ষণের হাত থেকে বাঁচিয়েছি বলে।')

কিন্তু শোভা সেন 'তিতাস' প্রসঙ্গে যে বলেছেন 'বাঙাল' (অর্থাৎ পূর্ব বাংলা থেকে যাঁরা পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছেন) তাদের দেখা শেষ হয়ে গেল বলে একশো রজনী 'হই হই করে' চললেও তার পরে আর 'টিকলোনা' তার পেছনে অন্য আর কোনও কারণ কী ছিল? সুধী প্রধান যে লিখেছেন 'অঙ্গারে' সম্প্রতি প্রতিক্রিয়াশীলদের কাছে যে ধাক্কা খেয়েছেন তার ফলে বোধ করি ওই বাঁচার তাগিদে তিনি 'তিতাসে' যে জীবন বেছে নিয়েছেন তার সঙ্গে পেশাদার মঞ্চের নাটকগুলির গুণগত পার্থক্য থাকলেও আজকের কৃষক জীবনের সমস্যা এ নাটকে নেই। বিধবা বিবাহের প্রসঙ্গটা বাদ দিলে এই মালোদের জীবন যে কোনও দেশের আদিবাসীদের জীবনের ছবি হতে পারে' ও কি তার অন্যতম কারণ হতে পারে না? অন্য একটি লেখায় তিনি যা বলেছেন তাও এর আরেকটি কারণ

হতে পারে বলে মনে হয়, 'মিনার্ভার 'তিতাস' সম্পর্কে গতবার আমি আলোচনা করেছি। সকলেই জানেন 'তিতাস' 'অঙ্গারের মত জনপ্রিয় হয়নি—যদিও উৎপল দত্ত, তাপস সেন ও দলের সকলের পরিশ্রমের কোনও অভাব ছিল না। গতবারে আমি বলেছিলাম যে 'তিতাসে'র জেলে আর বাহামা দ্বীপের অধিবাসীদের জীবন নিয়ে নাটক করলে কেবল এক বিধবা বিয়ের সমস্যা ছাড়া আর বড় একটা গুরুতর পার্থক্য ধরা যেত না। আসলে কলকাতায় যে দর্শক নিয়মিত থিয়েটার দেখে তাদের অধিকাংশই এই নাটকের মধ্যে Identification-এর সুযোগ পায়নি। তাই কিছু প্রগতিশীল ও বিদগ্ধ ছাড়া অধিকাংশ দর্শকের অন্তরে 'তিতাস' গভীর রস সৃষ্টি করতে পারেননি।' সুধী প্রধান অবশ্য লিখেছেন, 'তবু উৎপল দত্ত মশায় এই ধরনের নাটক নিয়ে প্রচেষ্টা চালিয়ে গেলে—নিশ্চয় নতুন দর্শক তৈরি করার পক্ষে সুবিধা হবে।' (গণ নব সৎ গোষ্ঠীনাট্য কথা)। অন্যতর দায়িত্ব পালন অথবা অন্য যে কোনও কারণে হোক, ওই প্রযোজনা আর চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

চার

চল্লিশের দশকের প্রথমার্ধে অদ্বৈত মল্লবর্মণের জীবদ্দশায় প্রকাশিত সম্ভবত তাঁর একমাত্র বই 'ভারতের চিঠি-পার্ল বাককে' প্রকাশিত হয়। তখন তার দাম ছিল বারো আনা। সুবোধ চৌধুরি জানিয়েছেন, কলকাতার কলেজ রো থেকে কোনও একটি প্রকাশনী এই বই বের করে। এতে পার্ল বাককে 'দিদি' সম্বোধন করে এ ধরনের বই তিনি ভারতকে নিয়েও লিখতে পারতেন বলে আবেগে অথবা অনুযোগ প্রকাশ করে এখানকার নিম্নবর্গের মানুষদের কথা লিখেছেন তিনি তাঁর এই বইতে। সেই সঙ্গে এশীয় জাতিসমূহের উত্থানে তাঁর আবেগকেও তিনি এখানে গোপন করেননি। ১৯৩৮-এ মার্কিন এই লেখিকা তাঁর 'গুড আর্থ' উপন্যাসের জন্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন, আর এই বছরের শুরুতে অদ্বৈত দ্বিতীয়বার 'নবশক্তির'র সম্পাদনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। পার্ল বাক ১৯২৪ থেকে ৩১ পর্যন্ত চিনে অধ্যাপনা করেন। সেই সুবাদে তিনি দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের নিত্যসাথি চিনা জনগণকে অত্যন্ত নিকট থেকে পর্যবেক্ষণের সুযোগ পান। আর সেই অভিজ্ঞতা থেকেই দরিদ্র চাষি লাং ওয়াদের জীবন নিয়ে তিনি লেখেন তাঁর উপন্যাস 'গুড আর্থ'। সন্দেহ নেই, এই উপন্যাসটি পড়ে অদ্বৈতের মনে তাঁর নিজের মালো সম্প্রদায়ের কথাও ভেসে উঠেছিল। যার পরিণতিতে তিনি 'তিতাস একটি নদীর নাম' লেখেন।

(আবার ১৯৪৯-এর মার্চ থেকে ১৯৫০-এর মে পর্যন্ত 'দেশ'-এ অদ্বৈত ধারাবাহিকভাবে আরভিং স্টোনের 'লাস্ট বয় ফর লাইফে'র বাংলা অনুবাদ 'জীবনতৃষা' প্রকাশ করেন। এর বেশ আগেই 'মোহাম্মদী'তে 'তিতাসে'র অসম্পূর্ণ খসড়াটি প্রকাশিত হয়ে গেলেও উপন্যাসের মূল পাণ্ডুলিপি তিনি তখনও লিখে উঠতে পারেননি। এ থেকে মন হয়, 'লাস্ট ফর লাইফে'র একটি প্রভাবও অদ্বৈত ও 'তিতাসে'র মূল পাণ্ডুলিপিতে পড়েছে।) প্রসঙ্গত একটি কাকতালীয় সাদৃশ্যের কথা স্মরণ করা যায়। যে ভ্যান গগের জীবন নিয়ে 'লাস্ট ফর লাইফ' লেখা তার প্রসঙ্গে ডাক্তার প্যাচেট বলে, All artists are crazy, that's the

best thing about them. I love them that way, I sometimes wish I could be crazy myself ! No excellent soul is exempt from a mixture of madness! Do you know Who said this? Aristotle, that's who. কিন্তু শিল্পী যখন মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে তখন তার ভাই থিও ডাক্তারকে স্মরণ করিয়ে দেয় I know Doctor, but he is a young man, only thirty-seven. The best part of life is still before him. চিত্র ও কথা—এই উভয় শিল্পে ভাষা বুনে চলার যে দুর্লভ ক্ষমতা ভ্যান গগ ও অদ্বৈত মল্লবর্মণ পরস্পরের থেকে বহুদূরে অবস্থান করে অন্তর্গত আত্মীয়তার কারণে দুই ভিন্ন কাল ও পরিবেশে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছিলেন তাই কি তাঁদের উভয়কে একেবারে আক্ষরিকভাবেই সাঁইত্রিশ বছর আয়ু দিয়েছিল? (অদ্বৈতর জীবনসীমা (১৯১৪-১৯৫১)। অদ্বৈতর চিলেকোঠার কথা মনে রেখে যদি ভ্যান গগের উক্তি স্মরণ করি তাহলে বুঝতে পারি কোন সমতলে তারা পরস্পরের সঙ্গে এসে মিলেছিলেন : 'I am a labourer, replied Vincent, not a capitalist, I cannot pay your six frances a day' ক্ষুধার্ত থাকার ও হতশ্রী দারিদ্র্যের যে চিত্র অদ্বৈত ও তাঁর পরিপার্শ্বে দেখেছি তাই কিছুটা ভিন্নভাবে ভ্যান গগের বাস্তবতায় এসে উপস্থিত : For three days he went without a bite of food, working at water-colours at Mauve's in the mornings, sketching in the soup-kitchens and third class waiting rooms in the afternoons and going either to pulchri' or Mauve's to work again at night. কিন্তু বাস্তবতা অপরিবর্তিতই থাকে : The low dull ache at the pit of his stomach turned his mind back to Borinage. Was he to be hungry all his life? Was there never be a moment of comfort or peace for him anywhere?

এই তিক্ত বাস্তবতা সত্ত্বেও অদ্বৈত, যেমন তেমনি ভ্যান গগও হার মানেননি। 'তিতাসে' যেমন কাদির মিয়া বা রামপ্রসাদের মতো 'ধর্মভীরু' মানুষের সাক্ষাৎ মেলে তেমনি ন্যুনেনেও 'তিতাসে'র জেলেপাড়ার প্রতিবেশীর মতো এখানেও ওই ধরনের কৃষকদের দেখা পাওয়া যায়। Neunen was in reality only a small cluster of hourses that lived both sides of the road from Eindhoven, the metropolis of the district. Most of the people were weavers and peasants whose huts dotted the health. They were god-fearing, hard working people who lived according to the manners and customs of their ancestors. এখানে বা 'তিতাসে' বিষয়টি ইতিবাচক, কারণ ঐতিহ্যের ওই শেকড় তাদের hard working-ই রেখেছে : মৃত্তিকার শ্রম থেকে বিচ্ছিন্ন করেনি। পুরোহিতের ভূমিকা থেকে ভ্যান গগের উত্তরণ এর সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য। ভিনসেন্ট খনি শ্রমিকদের দেখতে যায় তখন তাদের একজন, Jacques Verncy তাকে বলে, 'Ah monsieur, so many people have tried to help us: But life here goes on just as it always has.' পরে আরও জানা যায়, Here in the Borinage we are not even slaves, we are animals. We descend marcasse

at three in the morning; the fifteen minutes we can rest while we eat our dinner, and then we work on until four in the afternoon. It is black down there, Monsieur, and hot. So we must work naked and the air is full of coal-dust and poison gas, and we cannot breath! When we take the coal from the couche there is no room to stand up, we must work on our knees and doubled in two. We begin to descend, boys and girls alike, when we are eight or nien. By twenty we have the fever and lung trouble. If we do not get killed by 'grisou' or in the cage...we may live until forty and then die of consumption! Do I tell lies, Verncy?' এ অবস্থায় ভিনসেন্ট now lived in the same kind of house as the miners, ate the idential food, and slept in the identical bed. He was one of them. He had the right to bring them the Word of God. কিন্তু অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সে অবশেষে বুঝতে পারে, The word of God had become a luxury that the miners could not affond প্রায় জন্তুর এই জীবন দৃশ্যত ততটা স্পষ্ট না হলেও মালোরাও যে যাপন করে এবং সে কারণে ঈশ্বরের করুণা থেকে যথেষ্ট দূরে অবস্থান করে 'তিতাস' পড়ে তা সহজেই বোঝা যায়।

হয়তো অন্তর্গত এই সাদৃশ্যের কারণে 'তিতাসে'র মালোপাড়ার মতো 'লাস্ট বয় লাইফে'র জেলেপাড়া, অঙ্কিত হয়েও, যথেষ্ট আন্তরিক ও যথাযথ। তফাত শুধু এই, 'লাইফ'-এর পটভূমি সমুদ্র আর 'তিতাসে' তা নদী, অনুচ্ছেদ ও উদ্ধৃতাংশের শেষাংশে বোঝা যায় কোথায় তাদের প্রকৃত মিল : Vincent discovered Scheveningen and oil painting at about the same time. Scheveningen was a little fishing village lying in a valley of two protective sand dunes on the North Sea. On the beach there were rows of square fishing barks with one mast and deep-coloured, weather beaten sails. They had rude, square rudders behind, fishing nets spread out ready for the sea, and a tiny rust-red or sea-blue triangular flag alot. There were blue wagons on red wheels to carry the fish to the village; fisherwives in while oilskin caps fastened at the front by two round gold pins; family crowds at the tides edge to welcome the barks; the Kurzaal flying its flags, a pleasure house for foreigners who liked the taste of salt on their lips, but not chocked down their throats. The sea was grey with whitecaps at the shore and ever deepening hues of green fading into a dull blue; the sky was a cleaning grey with patterned clouds and an occasional design of blue to suggest to the fishermen that a sun still shines over Holland. Scheveningen was a place where men worked, and the people were indigenous to the soil and the sea.

ভিনসেন্টের ছবির কৌশলগত ত্রুটি দেখিয়ে রেভারেন্ড পিটারসেন তাকে বলে, You

must learn your elementary technique first and then your drawing will come slowly. পিটারসেনের সঙ্গে মিলে ভিনসেন্ট ওই ত্রুটি দূর করে। কিন্তু তারপরেই রেভান্ড স্বীকার করেন, Yes, I see what you mean, I've given her proportion and taken away character. পরে তিনি আরও বলেন, 'I think you are right. She has no face and isn't any one particular person. Some how she's Just all the miners wives in the Borinage put together. That something you've caught in the spirit of the miner's wife, Vincent, and that's a thousand times more important than any correct drawing. 'তিতাসের বাসন্তী সম্পর্কেও কি তা বলা যায় না? ভ্যান গগকে চিত্রশিল্পী হেনরি তুলোস লোত্রেক যে বলেছে If you had idealized or sentimentalized the women, you would have made them ugly because your Portaits would have been cowardly and false. But you stated the full truth as you saw it, and that's what beauty means তা বাসন্তীর চরিত্রের মূলকথা। অদ্বৈত মল্লবর্মণ কলকাতায় বসবাস করেও যেমন তেমন তার সত্তার তিতাসকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন তেমনি সিওর সতর্কতাকেও ভিনসেন্ট গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করে একে তার চরিত্রে পরিণত করেছিলেন : You are to learn about light and colour from the Impressionists. That much you must borrow from them. But nothing more. You must not imitate. You must not get swamped. Don't let Paris submerge you. অবশেষে যখন সে প্যারিস ত্যাগ করতে চায় তখন সে নিজেই সেওকে বলে I am not a city painter, I want to go back to my fields. I want to find a sun so hot that it will burn everything out of me but the desire to Paint. অদ্বৈত যদিও কলকাতা ত্যাগ করে তিতাসের পাড়ে আর কখনও ফিরে আসেননি, তবু অনন্তের মধ্য দিয়ে উপন্যাসে তার ওই মনোভ্রমণ ঘটেছে। তাছাড়া নিজের সমগ্র জীবন ও সত্তা জুড়ে তিনি ছিলেন তিতাসের কবি, তার কথাকার। ভিনসেন্ট সম্পর্কে যা বলা হয়েছে he set up his casel, drew a long breath and shut his eyes, No man could catch such colourings with his eyes open তা অদ্বৈতের শারীরিকভাবে কলকাতায় অবস্থান করে অন্তর্চক্ষু খুলে দিয়ে 'তিতাস' রচনার সঙ্গে তুলনীয়। তৃণমূলের মানুষের কাছে গিয়ে ভিনসেন্টের যা মনে হয়েছিল, নিজের স্মৃতি ও তার গভীরে বসবাস করে অদ্বৈতও তাতে বেঁচেছিলেন : They had discovered the art! They had discovered light and breath, atmosphere and sun they saw things filtered through at the innumerable forces that live in that vibrant fluid. এ থেকে জাত শিল্পচিন্তায় শুধু ভিনসেন্টেরই নয়, অদ্বৈতরও ভাবনা রয়েছে : Photographic machines and academicians would make exact duplicates; painters would see everything filtered through their own natures and the sun-swept air in which they worked. It was almost as though these men had created a new art. স্যুরাট চেয়েছে শিল্পকর্মকে abstract science এ পরিণত করতে। সে মনে করে We must learn to pigeonhole our

sensations and arrive at a mathematical precision to mind. Every human sensation can be and must be reduced to an abstract statement of colour, line and tone. কিন্তু ভিনসেন্টের জিজ্ঞাসা, how can we make painting an impersonal science when it is essentially the expression of individual that counts? ভিনসেন্ট অবশ্য স্যুরাটের কাছ থেকেও নেয় এবং দুটিকে মিলিয়ে তার নিজস্ব শিল্পরীতি গড়ে তোলে। অদ্বৈতর ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি ঘটেছে। শৈল্পিক ঋজুতার সঙ্গে তার গীতিময়তাকে মেলানোর যে দক্ষতা 'তিতাসে' লক্ষ করা গেছে তা থেকে এই শিল্পরীতির পরিচয় মেলে। তাঁর গ্রন্থভাণ্ডারে The loom of Language, Introduction to Modern Architecture বা বোক্কাসিও, বালজাক, লরেন্স ও হাক্সলির রচনা সংগ্রহ থেকে বোঝা যায়, এ বিষয়ে তিনি সচেতন প্রয়াস চালিয়েছিলেন। অতএব Lust for Life-এর ষষ্ঠ পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ অনুচ্ছেদে ভ্যান গগ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা অদ্বৈত ও তাঁর সৃজনপ্রয়াস সম্পর্কেও প্রযোজ্য : The desire to succeed had left Vincent. He worked because he had to, because it kept him from suffering too much mentaly, because it distracted his mind. He could do without a wife, a home, and children; he could do without love and friendship and health he could do without security, comfort and food; he could even do without God. But he could not do without something which was greater than himself. Which was his life-the power and ability to create.

পাঁচ

'Lust for life' এ ভিনসেন্টকে থিও বলছে, The Third Republic will probably be permanent. The royalists are quite dead and the socialists are coming into power. Emile Zola was telling me the other night that the next revolution will be against capitalism in steady of royalits. আর পরের শতাব্দীর মধ্যভাগে উপন্যাস লিখে অদ্বৈত দেখাচ্ছেন তিতাসপারের প্রান্তিক মানুষদের ধ্বংসের কৃষ্ণ মেঘের আড়ালে কোথাও নতুন জীবন ও পৃথিবী সৃষ্টির রুপালি রেখাও দেখা দিচ্ছে। মার্কসবাদী না হয়েও একজন সৎ লেখকের পক্ষে তাকে এড়িয়ে যাওয়ার কোনও উপায় ছিল না। বিষয়টি নিয়ে অদ্বৈত যে ভেবেছেন তা তার গ্রন্থভাণ্ডারের কয়েকটি নির্বাচিত বইয়ের কথা মনে রাখলে বোঝা যায়। ওই সংগ্রহে যেমন ছিল, The penguin political Dictionary, The Penguin Political Dictionary : New Writing-এর মতো অভিধান তেমনি এস. এ. ডাঙ্গের Idia from Primitive Communism to Slavery, স্ট্যালিনের Marxism and National Question, লেলিনের ইংরেজি রচনা সংগ্রহ, লুই ফিশারের 'গান্ধি ও স্ট্যালিন' রাহুল সাংকৃত্যায়নের 'বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ', 'মার্কসীয় অর্থশাস্ত্র', রেবতী বর্মণের 'সোভিয়েত ইউনিয়ন', অমর সান্যালের 'চীনের ইতিহাসের ধারা', গোপাল হালদারের 'এ যুগের যুদ্ধ' ও পঞ্চাশের মন্বন্তরকে নিয়ে লেখা তাঁর ট্রিলজি 'একদা', '১৩৫০' ও পঞ্চাশের পর'-এর মতো বই।

কিন্তু তা সত্ত্বেও অদ্বৈতর আসল পরিচয় তিনি শিল্পী। অতএব তাঁর মৃত্যুর পর ভ্যান গগ সম্পর্কে তাঁর চিকিৎসক ডাক্তার গ্যাচেট যা বলেছেন তা সীমিত ও অদ্বৈতর নিজস্ব অর্থে তার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, বিশেষত উদ্ধৃতাংশের শেষ বাক্যটি : **Let us that not despair, we who are Vincent's friends. Vincent is not dead. He will never die. His love, his genius, the great beauty he as created will go on for ever...I look at his paintings and find there a new faith, a new meaning of life...He fell a martyr to his love of art.**

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : মিন্না আলি, মো. আবদুল আউয়াল (আবু হেনা), কালেক্টরেট লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক কোহিনুর বেগম ও কর্মচারী মো. জহিরুল ইসলাম, কুমিল্লা।

* সৌজন্যে : 'ভাসমান', ১৯৯৭।